XXCE
বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
৯৩ বর্ষ ১৫৪ সংখ্যা মঙ্গলবার ২ ভাদ্র ১৪২১ কলকাতা

চিন দূর অস্ত্

একটি অপ্রিয় সিদ্ধান্ত লইলেই বলিষ্ঠ এবং সাহসী রাষ্ট্রনায়কের দায় ফুরায় না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁহার সাহস এবং বলিষ্ঠতা প্রমাণের কাজ শুরু করিয়াছেন। অতঃপর তাঁহাকে স্বনির্দেশিত সেই পথ অনুসরণ করিতে হইবে। আরও অনেকগুলি অপ্রিয় সিদ্ধান্ত বলবৎ করিতে হইবে। দ্রুত। আগামী স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় দাঁড়াইয়া বলিবার জন্য অপেক্ষা করিলে চলিবে না। স্বাধীনতা দিবস বছরে এক বার আসে। এক বছর অতি দীর্ঘ সময়। কাজের বিশদ তালিকা পেশ করিবার অবকাশ নাই, তাহার প্রয়োজনও নাই। আপাতত একটি কাজের কথাই যথেষ্ট। যে চিনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া যোজনা কমিশনকে বিদায় জানানো হইতেছে, এমনকী তাহার স্থলে প্রস্তাবিত নূতন সংস্থাটির নামও ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট রিফর্ম কমিশন রাখিবার কথা উঠিয়াছে, সেই চিনের রীতি অনুসারেই প্রধানমন্ত্রী আর একটি প্রতিষ্ঠানের সংস্কারে মনোযোগ করিতে পারেন। সেই প্রতিষ্ঠানটির নাম কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা।

নরেন্দ্র মোদী যখন তাঁহার মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তুতি চালাইতেছিলেন, তখন আশা জাগিয়াছিল, তিনি একটি যথার্থ নির্মেদ সরকার তৈয়ারি করিবেন। সেই আশা সম্পূর্ণ বিফল হয় নাই, পূর্ববর্তী ইউপিএ সরকারের মন্ত্রিসভা অপেক্ষা প্রায় চল্লিশ শতাংশ ক্ষুদ্রতর মন্ত্রিসভা লইয়া এনডিএ সরকার কাজ শুরু করিয়াছিল। কিন্তু পরিমাণগত পরিবর্তন কখন গুণগত পরিবর্তনে পর্যবসিত হইবে, তাহা শতাংশের পাটিগণিত কষিয়া স্থির করা যায় না। প্রধানমন্ত্রী মোদী যথার্থ প্রশাসনিক সংস্কারের সূচনা করিতে চাহিলে মনমোহন সিংহের সরকারকে মাপকাঠি সাব্যস্ত করিলে চলিবে না, যথার্থ মেদবর্জিত প্রশাসনের সহিত নিজের তুলনা করিতে হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উৎকৃষ্ট মাপকাঠি, কিন্তু আপত্তি উঠিতে পারে: উন্নত দেশ এবং উন্নয়নশীল দেশ অ-তুলনীয়। চিন আমেরিকা নহে, তদুপরি ভারতের সহিত তাহার তুলনা বহুলপ্রচলিত। চিনে মন্ত্রিসভার আয়তন মনমোহন সিংহের তুলনায় প্রায় এক-চতুর্থাংশ, কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর তুলনায়ও অর্ধেকের কম। চিনে ঠিক যে যে মন্ত্রক আছে, মন্ত্রকগুলিকে যে ভাবে ভাগ করা হইয়াছে, ভারতেও তাহাই করিতে হইবে, এমন নিশ্চয়ই নহে। সামাজিক পরিস্থিতির জটিলতার কারণে ভারতে কয়েকটি বিশেষ দফতরের প্রয়োজনও হয়তো আপাতত থাকিতে পারে। কিন্তু সে সকলই খুঁটিনাটির প্রশ্ন। মূল চরিত্রে সাদৃশ্য বিস্তর। কেন সমস্ত জ্বালানি বা সমস্ত পরিবহণের জন্য একটি করিয়া মন্ত্রক যথেষ্ট নয়, তাহার কোনও সদুত্তর মনমোহন সিংহের ঝুলিতে ছিল না, নরেন্দ্র মোদীর তহবিলেও নাই।

মন্ত্রিসভার সদস্যদের শিক্ষাদীক্ষা বা কর্মক্ষেত্রের বিচারেও চিনের নিকট ভারতের শিখিবার আছে। গত দশকের প্রথমার্ধে জিয়াং জেমিন-এর নেতৃত্বে চিনের কমিউনিস্ট পার্টি দলীয় তথা প্রশাসনিক কাঠামোয় শিল্পোদ্যোগী ও পেশাজীবীদের গুরুত্ব দানের যে রীতি প্রবর্তন করে, তাহা উত্তরোত্তর জোরদার হইয়াছে। এখন চিনের প্রশাসনের উচ্চস্তরে, বিশেষত মন্ত্রিসভায়, উচ্চশিক্ষিত, প্রশিক্ষিত এবং পেশাজীবী সদস্যের আধিপত্য অতি প্রবল। ভারতের মতো দেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পথে উঠিয়া আসা নেতৃত্ব সচরাচর উচ্চশিক্ষায় কৃতী হইবেন না, তাহা অপ্রত্যাশিত নয়। এমনকী, তাঁহাদের অনেকের মনেই উচ্চশিক্ষিত বা পেশাজীবীদের প্রতি এক ধরনের অসূয়া নিহিত থাকিবে, ইহাও অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু সেখানেই প্রকৃত নেতার দায়িত্ব। নির্বাচনী রাজনীতির পথে না হউক, সমান্তরাল প্রক্রিয়ায় তেমন যোগ্য ব্যক্তিদের মন্ত্রিসভায় লইয়া আসিতে হইবে। মনমোহন সিংহকে নরসিংহ রাও সেই ভাবেই আনিয়াছিলেন। নরেন্দ্র মোদী এখনও তাহার কোনও উদ্যোগ করেন নাই। করা দরকার। তাহা না হইলে, যোজনা কমিশন-উত্তর পর্বেও চিন দূর অস্ত্।

রক্ষাকর্তা

সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতি ক্রমশই বড় সমস্যার ব্যাপার হইয়া উঠিতেছে। ইহার প্রবক্তারা তাঁহাদের যাবতীয় মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন মহিলাদের পোশাকের ছাঁট, ছাঁদ, ঝুল কেমন হইবে, তাহার উপর। ভারতীয় সংস্কৃতিকে রক্ষা করিতে হইলে যেন কেবল মহিলাদের পোশাকের উপর নজরদারি করিলেই চলিবে। এ ব্যাপারে ইদানীং সর্বাপেক্ষা তৎপর দেখা যাইতেছে গোয়ার মন্ত্রী ও জনপ্রতিনিধিদের, যাঁহারা আইনসভার ভিতরে ও বাহিরে ক্রমাগত এই বিষয়ে তাঁহাদের মন্তব্য উগরাইয়া দিতেছেন। কেহ বলিতেছেন, গোয়ার সৈকতে কিংবা পাব-এ মহিলাদের স্বল্প দৈর্ঘ্যের পোশাক পরিয়া ঘোরা অনুচিত। কেহ আবার পরামর্শ দিতেছেন, বিকিনি জাতীয় হ্রস্ব পোশাকে সৈকতে বিচরণকারী বিদেশিনি পর্যটকদের জন্য একটি স্বতন্ত্র সৈকত নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হউক, যাহাতে তাঁহাদের দেখিয়া গোয়ার অন্য পর্যটক ও জনসাধারণ তাঁহাদের মহান সংস্কৃতি হইতে বিচ্যুত না হন। একই সঙ্গে ওই সৈকতে বিচরণকারী মহিলাদের জন্য 'বিকিনি-কর' ধার্য হউক, যাহাতে রাজ্যের পর্যটন দফতরও দু'পয়সা কামাইতে পারে। এমন পরামর্শের জন্য তিনি ভারতরত্ন না হউক, অন্তত পদ্মশ্রী তো পাইতেই পারেন।

এই সব জনপ্রতিনিধি এবং মন্ত্রীদের মুখ হইতে অনর্গল নিঃসৃত হইয়া চলিয়াছে। তাঁহাদের বোধহয় দুই একটি কথা বুঝাইয়া দেওয়া দরকার। এক, সনাতন কিংবা আধুনিক, ভারতীয় সংস্কৃতির সুরক্ষার কোনও প্রয়োজন নাই। বহু সংস্কৃতির দেশ ভারতকে একমাত্রিক সংস্কৃতির ছাঁচে বাঁধিয়া ফেলার মধ্যে এক ধরনের স্বৈরাচার আছে। দ্বিতীয়ত, অন্তত সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতিতে মহিলাদের পরিধেয় বোরখার মতো কোনও আপাদমস্তক আবৃত করা পোশাক ছিল না। ভারতের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যের দিকে এক ঝলক তাকাইলেই তাহা উপলব্ধ হয়। এত স্বল্প শিক্ষা, এত অধ্যয়নহীনতা, সংস্কৃতি বিষয়ে চর্চারহিত, অনুশীলনবর্জিত এমন পাহাড়প্রমাণ অজ্ঞতা ও মূঢ়তার সযত্নলালিত সম্পদ লইয়া তাঁহারা সনাতন সংস্কৃতিকে দেশবাসী ও পর্যটকদের উপর চাপাইতে ব্যগ্র যে, প্রায়শ তাঁহাদের সেই ব্যগ্রতা উপহাসের বিষয় হইয়া ওঠে। অথচ গোয়া ঠিক সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির পীঠস্থানও নয়, পর্তুগিজ সান্নিধ্যে বিবর্তিত ইউরোপীয় ও ভারতীয় সংস্কৃতির এক সমন্বিত এবং সমৃদ্ধ সংশ্লেষ।

অন্যায়ের অন্য দিকটি হইল, বিদেশি অপসংস্কৃতির আগ্রাসন হইতে ভারতীয় মহিলাদের 'রক্ষা' করার নামে তাঁহাদের উপর রকমারি বিধিনিষেধ আরোপ। এই নিষেধের মধ্যে যেমন মেয়েদের জিন্স পরা আছে, তেমনই আছে তাঁহাদের মোবাইল ফোন ব্যবহারও। এক কথায় হরিয়ানা-উত্তরপ্রদেশের জাঠ চণ্ডীমণ্ডপে খাপ পঞ্চায়েতের মাতব্বররা যে-সব প্রতিক্রিয়াশীল বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া থাকেন, গোয়ার আলোকপ্রাপ্ত মন্ত্রী-বিধায়করা তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতেছেন। নিয়মিত মহিলারা গণধর্ষিত হইতে থাকিলে তাহার কারণ হিসাবে পুরুষের ক্ষমতার আস্ফালন নয়, মহিলাদেরই 'খোলামেলা' পোশাকের ভূমিকা লইয়া এই সংস্কৃতির প্রবক্তারা মুখর। সুখের কথা, এই সংস্কৃতিরক্ষকদের বিধিনিষেধের কেহ বিশেষ তোয়াক্কা করিতেছে না। সংস্কৃতিরক্ষার নামে মহিলাদের পরিধেয় ও আচরণবিধি নির্দিষ্ট করিয়া দিবার পিতৃতান্ত্রিক ষড়যন্ত্রটিও ক্রমশ সমাজ, বিশেষত তরুণ প্রজন্ম দিব্য ধরিয়া ফেলিতেছেন।

ভারতে কি সত্যি অনেক ধনী আছেন?

মৈত্রীশ ঘটক ও দেবরাজ রায়

ভারতের মতো একটা গরিব দেশে যত জন মহা-ধনী থাকা প্রত্যাশিত, বাস্তবে তেমন বড়লোকের সংখ্যা তার চেয়ে বেশি। কালো টাকার কথা মনে রাখলে, সম্ভবত আরও বেশি। সে দিকে নজর রাখলে না-জানা গল্পের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

দিনকয়েক আগে খবরের কাগজে বেরিয়েছে, গোটা দুনিয়ায় মাল্টি-মিলিয়নেয়ারের সংখ্যার নিরিখে ভারত আট নম্বরে রয়েছে। মাল্টি-মিলিয়নেয়ার মানে এমন মানুষ, যাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ অন্তত দশ মিলিয়ন, মানে এক কোটি ডলার। টাকার অঙ্কে, ষাট কোটির কাছাকাছি। নিউ ওয়ার্ল্ড ওয়েলথ নামক একটি সংস্থা যে ওয়েলথ ইনডেক্স, মানে সম্পদের সূচক, তৈরি করেছে, তাতেই জানা গিয়েছে, ভারতে এমন 'ষাট কোটি'-পতি বা অতি-ধনীর সংখ্যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন, জার্মানি বা ব্রিটেনের তুলনায় কম বটে, কিন্তু কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া বা ফ্রান্সের থেকে বেশি। কিন্তু ভারতের জনসংখ্যা যেহেতু চিন ছাড়া আর সব দেশের থেকে বেশি, তাই অতি-ধনীই হোক বা দরিদ্র, সর্বশ্রেণির মানুষের সংখ্যাই ভারতে প্রচুর। তাই, প্রশ্ন হল, ভারতে জনসংখ্যার নিরিখে ধনীর সংখ্যা কি অন্য দেশের থেকে বেশি? গোটা দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি দরিদ্র মানুষও যেহেতু বাস করেন ভারতেই, ভারতীয় হিসেবে ধনীর সংখ্যার প্রাচুর্যের খবরে আমরা আনন্দিত হব, না কি চরম আর্থিক বৈষম্যের প্রতিফলন ভেবে উদ্বিগ্ন হব?

ভারতকে নিয়ে একটা বড় মুশকিল হল, দেশটা এমনই বড় যে কোনও পরিসংখ্যান দেখেই চোখে ঝিলিমিলি লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। এবং, সেই সংখ্যাটার মানে আসলে কী, সেটা কম না বেশি, নাকি সত্যিই বিস্ময়কর, সংখ্যা দেখে সেটা বোঝা কঠিন কাজ। অনেকেই সেটা বুঝতে পারেন না। সেই কঠিন কাজটা সহজ করে নেওয়ার একটাই মন্ত্র আছে: 'ভারত-সংক্রান্ত যে কোনও আপাতবিশাল পরিসংখ্যান পেলে প্রথমেই তাকে দেশের মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে দেখুন।' দেখবেন, অনেক পরিসংখ্যানই অনেক বেশি অর্থবহ হয়ে উঠছে।

ধনীদের নিয়ে পরিসংখ্যান পাওয়া যাচ্ছে নিউ ওয়ার্ল্ড ওয়েলথ (http://www.nw-wealth.com) সংস্থাটি থেকে। জানা যাচ্ছে, গোটা দুনিয়ায় অতি-ধনীর সংখ্যা ৪৯৫,০০০। তার মধ্যে ভারতের নাগরিক ১৪,৮০০ জন। অর্থাৎ, বিশ্বের ধনীদের তিন শতাংশ ভারতীয়। এ দিকে, বিশ্বের জনসংখ্যার ১৭ শতাংশ ভারতীয়। এই দ্বিতীয় পরিসংখ্যানটি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হচ্ছে না, ভারতে ধনীর সংখ্যা তুলনায় কম?

কিন্তু, দেশ হিসেবে ভারত দরিদ্র। কাজেই, ধনী দেশগুলোর সঙ্গে প্রত্যক্ষ তুলনায় লাভ নেই। আমরা বরং দেখি, ভারতের আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী এ দেশে যত জন ধনী থাকা প্রত্যাশিত, সত্যিই কি তত জন ধনী ভারতে আছেন? ভাল ভাবে এই হিসেব বুঝতে গেলে অঙ্ক কষতে হবে। সেই ঝামেলায় না গিয়ে, এখানে কাজ চালানোর মতো কিছু হিসেব কষে দেখা যাক বরং।

২০১২ সালে যখন ভারতে মাথাপিছু গড় আয় ছিল ১৫৫০ ডলার, গোটা দুনিয়ায় সেই গড় ছিল ১০,২৩৫ ডলার। অর্থাৎ, ভারতে মাথাপিছু গড় আয় দুনিয়ার গড়ের মাত্র ১৫ শতাংশ। অন্য দিকে আবার, বিশ্বের ধনীদের যত শতাংশ ভারতীয় (৩ শতাংশ), তার সঙ্গে বিশ্বের জনসংখ্যায় যত শতাংশ ভারতীয় (১৭ শতাংশ), তার অনুপাত হল ০.১৭। খেয়াল করে দেখুন, গড় আয়ের অনুপাত আর ধনীর অনুপাতের সংখ্যা দুটি মোটামুটি কাছাকাছি— ০.১৫ আর ০.১৭— যদিও প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টি একটু বেশি। কাজেই, বলা যেতে পারে ভারতে ধনীর সংখ্যা প্রত্যাশিত হারের চেয়ে একটু বেশি।

দুনিয়ার আরও কয়েকটা দেশের সঙ্গে তুলনা করলে ভারতের অবস্থা আরও স্পষ্ট ভাবে বোঝা যেতে পারে। চিনে মানুষের গড় আয় দুনিয়ার গড় আয়ের ৫৬ শতাংশ, আর অতি-ধনীর সংখ্যা দুনিয়ার ২৮ শতাংশ। কাজেই, চিনে অতি-ধনীর সংখ্যা প্রত্যাশার তুলনায় অনেকটাই কম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অতি-ধনীর সংখ্যা প্রত্যাশার তুলনায় অনেক বেশি। সুইটজারল্যান্ডে আরও বেশি।

তবে এই ধরনের তুলনার মধ্যে একটা সমস্যা আছে। গড় আয় যত কম হবে, আপেক্ষিক বৈষম্যের মাত্রা যদি একও থাকে, জনসংখ্যায় ধনীদের আপেক্ষিক গুরুত্ব আনুপাতিক ভাবে না কমে সাধারণত একটু বেশি-ই হারে কমে। ধরুন দুটো স্কুলের অঙ্ক পরীক্ষার ফলের তুলনা হচ্ছে। স্কুল দুটোর ছাত্র সংখ্যা সমান, এবং ছাত্রদের মধ্যে অঙ্কে পারদর্শিতার আপেক্ষিক বিন্যাসও এক, কিন্তু তার একটার গড় নম্বর অন্যটার অর্ধেক। তার মানে কি, যারা খুব ভাল করেছে (৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে) সেই ছাত্রদের সংখ্যাও কি অর্ধেক হবে? সাধারণত তা হয় না, তার একটু কমই হয়। এই ব্যাপারটা আমরা যদি নিয়ন্ত্রণ করি, তা হলে কিন্তু ছবিটা খানিক পাল্টায়।

যে অঙ্কের পথ ধরে গেলে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়, তার বিবরণ এই লেখার পক্ষে একটু বেশি খটোমটো হয়ে যাবে। এই নিয়ে আমরা অন্যত্র বিশদ আলোচনা করেছি (http://debrajray.blogspot.in)। এখানে সেই হিসেবের ফলাফলটুকু জানাই। মিলিয়নেয়ার বা দশ লক্ষ ডলারের মালিক (ভারতীয় টাকায় ছয় কোটির কাছাকাছি), যাঁদের আমরা 'ধনী' বলতে পারি, ভারতে তাঁদের সংখ্যা প্রত্যাশিত হারের তুলনায় বেশি নয়। কিন্তু, অতি-ধনীর (এক কোটি ডলারের মালিক) সংখ্যা বেশ খানিকটা বেশি। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনা করলে প্রত্যাশিত হারের প্রায় দেড়গুণ। অন্য ভাবে বললে, ভারতের আর্থিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে দেশে যত জন অতি-ধনী থাকা উচিত, অতি-ধনীর প্রকৃত সংখ্যা তার তুলনায় বেশি।

একটু অন্য ভাবেও দেখতে পারেন। ধরা যাক, বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া সুদের গড় হার বছরে ১০ শতাংশ। সুতরাং, এক কোটি ডলারের মালিক এক জন ভারতীয় বছরে ১০ লক্ষ ডলার সুদ পান বা আয় করেন। হিসেবের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক, ধনী, অতি-ধনী এই শ্রেণির সবাই এই গোত্রে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যে যে ন্যূনতম সম্পদের প্রয়োজন ঠিক ততটারই মালিক। ভারতে গড় মাথাপিছু আয় বছরে ১৫৫০ ডলার। জাতীয় আয়ের কত শতাংশ অতি-ধনীরা অর্জন করেন তা যদি হিসেব করি, তা হলে দেখব সারা পৃথিবীর গড়ের থেকে তা সামান্য বেশি (যথাক্রমে, ০.৮ এবং ০.৭ শতাংশ)। ধনীদের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো— জাতীয় আয়ের কত শতাংশ ভারতে ধনীরা অর্জন করেন তা যদি হিসেব করি, তা হলে দেখব সারা পৃথিবীর গড়ের থেকে তা খানিকটা কম (যথাক্রমে, ১.৩ এবং ১.৬ শতাংশ)। এ বার যদি মহা-ধনীদের (মোট সম্পদ ৩ কোটি ডলারের বেশি) দেখি, তা হলে আবার ভারতের জাতীয় আয়ে তাদের ভাগ সারা পৃথিবীর গড়ের থেকে বেশি (যথাক্রমে, ০.৪১ এবং ০.২৭ শতাংশ)।

বৈষম্যের দিক থেকে দেখলে ভারতের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার আরও কতকগুলো কারণ আছে। আমরা যে হিসেব কষেছি, তাতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভারতের তুলনা করেছি আমেরিকার সঙ্গে। তাতেও দেখা যাচ্ছে, ভারতে অতি-ধনীর সংখ্যা প্রত্যাশিত হারের তুলনায় অনেকটাই বেশি। এ দিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেশটাতেই আর্থিক অসাম্য রীতিমত চড়া। জাপান বা জার্মানির মতো দেশে অতি-ধনী মানুষের সংখ্যা প্রত্যাশিত হারের তুলনায় কম। সিঙ্গাপুর, হংকং এবং সুইটজারল্যান্ডে আবার অতি-ধনীর সংখ্যা প্রত্যাশিত হারের তুলনায় ঢের বেশি।

দ্বিতীয় কারণটা আরও মারাত্মক। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের ২০১০ সালের একটা সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে, ভারতের অর্থনীতির যে অংশটি কালো টাকায় চলে, যাকে ছায়া-অর্থনীতি বলা হয়, তার অনুপাত অন্তত ২০ শতাংশ, যেখানে আরও সচ্ছল দেশগুলোতে তা ১০ শতাংশের বেশি নয়। সবাই মনে করেন, ভারতের ক্ষেত্রে এই অনুপাত আসলে ২০ শতাংশের অনেক বেশি। ইউপিএ সরকারের নির্দেশে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ফিনান্স অ্যান্ড পলিসি ভারতের কালো অর্থনীতি বিষয়ে যে রিপোর্টটি তৈরি করেছিল, ২০১৩ সালে সরকারের হাতে তা জমা পড়ার পরেও চিদম্বরম বা অরুণ জেটলি যে রিপোর্টটিকে সংসদে পেশ করেননি, সম্প্রতি তার ভিতরের খবর জানার দাবি করল একটি সর্বভারতীয় সংবাদপত্র। সেই রিপোর্ট নাকি বলছে, ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন যত, দেশের কালো অর্থনীতির মাপ তার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ। এই ৭৫ শতাংশের হিসেবটাকে একেবারে কথার কথা বলে উড়িয়ে দেওয়া মুশকিল। ফলে, ভারতে অতি-ধনীদের আসল সংখ্যা আমাদের হিসেবের চেয়ে আরও বেশিই হবে।

অনেকের কাছে হয়তো অতি-ধনী বা মহা-ধনীর সংখ্যাধিক্য সুসংবাদ বলে গণ্য হবে। আমরা ততখানি আশাবাদী নই। বরং, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর রঘুরাম রাজন সম্প্রতি ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের বিপদের কথাটি যে ভাবে মনে করিয়ে দিয়েছেন, আমরা তার সঙ্গে একমত।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমাদের মূল বক্তব্য হল ভারত দুনিয়ার গড়ের তুলনায় গরিব, তাই ভারতে স্বাভাবিক ভাবেই দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বিশ্বের গড়ের তুলনায় বেশি, এবং ধনী মানুষের সংখ্যা বিশ্ব-গড়ের তুলনায় কম। কিন্তু, ভারতে লোকসংখ্যা এমনই বেশি যে ভারতের যে কোনও পরিসংখ্যানই চোখধাঁধানো, এবং অনেক সময়ই বিভ্রান্তিকর। কাজেই, যে কোনও ক্ষেত্রেই ভারতের পরিসংখ্যানকে অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা করার আগে জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে 'মাথাপিছু হিসেব' কষে নেওয়া ভাল। সেই হিসেবই বলছে, ভারতে 'ধনী'-র সংখ্যা প্রত্যাশিত হারের কাছাকাছিই আছে, কিন্তু 'অতি-ধনী'-র সংখ্যা প্রত্যাশিত হারের তুলনায় অনেকটা বেশি। কাজেই, ভারতের সবচেয়ে ধনী লোকরা ঠিক কী করছেন, সে দিকে নজর রাখলে কিছু না-জানা গল্পের সন্ধান পাওয়া যেতেও পারে বলেই মনে হয়। বাজিয়ে দেখতে ক্ষতি কী?

ভারতকে নিয়ে একটা বড় মুশকিল হল, দেশটা এমনই বড় যে কোনও পরিসংখ্যান দেখেই চোখে ঝিলিমিলি লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।

মৈত্রীশ ঘটক লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস্-এ অর্থনীতির শিক্ষক। দেবরাজ রায় নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি-তে অর্থনীতির শিক্ষক।

দারুণ কিছু নয়, কিন্তু অন্য বিকল্প নেই

অভিষেক চৌধুরি ও চিন্ময় কুমার

এ কথা নিশ্চয়ই বলা চলে না যে, নীতীশ কুমার এবং লালুপ্রসাদের জোটবন্ধন বিহারের পক্ষে এক পরম আশীর্বাদ। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতির বিচারে রাজ্যে বিজেপির উত্থানের মোকাবিলায় আপাতত এ ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই। এবং, এই জোট হয়তো দিব্যি কাজও চালিয়ে দেবে।

সংবাদমাধ্যমে বিচারবিশ্লেষণ থেকে এটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে, বিহারে নীতীশ কুমারের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অন্ধকার। গত বছর বিজেপির সঙ্গ ছেড়ে তিনি যে বিরাট ভুল করেছেন, লোকসভা নির্বাচনে তার চড়া মাসুল দিতে হয়েছে। কিন্তু সমালোচকদের মতে, তাঁর ভুলের পালা সেখানেই শেষ হয়নি— যে লালুপ্রসাদ তাঁর চরম শত্রু, তাঁর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে নীতীশ কুমার রাজনীতির মাঝমাঠে ফিরে আসার সমস্ত সম্ভাবনা জলাঞ্জলি দিয়েছেন। ২১ অগস্ট বিহারের দশটি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনে নীতীশ কুমারের জেডি(ইউ) এবং লালুপ্রসাদের আরজেডি'র সঙ্গে কংগ্রেসও একজোট হয়ে লড়ছে বটে, তবে আলোচনা বা তর্কবিতর্ক যা হচ্ছে, তা প্রধানত প্রথম দুটি দলের জোট নিয়েই।

এই দু'দলই যে মরিয়া হয়ে হাত মিলিয়েছে, সেটা বোঝা কঠিন নয়। বিজেপি রামবিলাস পাসওয়ানের এলজেপি এবং উপেন্দ্র কুশবহার আরএলএসপি'র সঙ্গে জোট বাঁধার পরে বিহারে এনডিএ রীতিমত শক্তিশালী হয়েছে। উচ্চবর্ণের সমর্থন তো আগেই ছিল, এই শরিকদের কল্যাণে তার সঙ্গে যোগ হয়েছে ওবিসি, ইবিসি এবং দলিতদের ভোট। এই গোষ্ঠীগুলি আগে নীতীশ কুমার অথবা লালুপ্রসাদের সঙ্গে ছিল। স্বভাবতই তাঁরা বিপাকে পড়েছেন। তার ওপরে আছে তাঁদের দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি-বিরোধী জোট এককাট্টা করার জন্য তাঁদের বাধ্য হয়েই জোট গড়তে হয়েছে, তা না হলে আসন্ন উপনির্বাচনে এবং আরও অনেক বেশি করে আগামী বছরের দ্বিতীয়ার্ধে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে লড়বেন কী করে?

এ পর্যন্ত গল্পটা ঠিক আছে। কিন্তু এর পরেই শুরু হয় কল্পকাহিনি। প্রথমত বলা হচ্ছে, নীতীশ তাঁর উন্নয়নের মঞ্চ ছেড়ে সেই পুরনো জাতপাতের রাজনীতির আশ্রয় নিয়েছেন, ২০০৫-এর আগেকার জমানাতেই ফিরে গেছেন। ঘটনা হল, নীতীশ কোনও দিনই জাতপাতের গুরুত্ব অস্বীকার করেননি। বিজেপি'র সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার চালানোর সময় তিনি নিশ্চয়ই বিহারের প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে জোরদার করতে চেয়েছেন, রাজ্যের আর্থিক বৃদ্ধির উপর জোর দিয়েছেন, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে নতুন জাতপাতভিত্তিক জোট তৈরির চেষ্টাও চালিয়ে গেছেন। যেমন, পঞ্চায়েত স্তরে ইবিসি'র জন্য সংরক্ষণ, 'মহাদলিত' গোষ্ঠীর সৃষ্টি এবং তাদের জন্য নানা ধরনের কল্যাণ প্রকল্প, ইত্যাদি। আবার নানা উপলক্ষে তিনি উচ্চবর্ণকেও সন্তুষ্ট করতে তৎপর হয়েছেন, যেমন ভূমি সংস্কার বিষয়ে বন্দ্যোপাধ্যায় কমিটির সুপারিশ কার্যকর না করার সিদ্ধান্ত। সোজা কথাটা হল এই যে, জাতপাতের রাজনীতির সঙ্গে উন্নয়নের অনিবার্য কোনও বিরোধ নেই।

লালুপ্রসাদের বিরোধিতা করে যে জেডি(ইউ)-এর জন্ম, সে যখন আরজেডি'র সঙ্গে জোট বাঁধে, তখন সেই জোটকে একটা পশ্চাদ্‌মুখী রাজনীতি বলে সমালোচনা করার কারণ আছে। কিন্তু আদর্শ বা নীতির দিক থেকে দেখলে বিজেপির সঙ্গে নীতীশ কুমারের জোট বাঁধার সিদ্ধান্তটাই আরও বেশি সমস্যাসঙ্কুল ছিল। এই দুই দলের স্বার্থ এবং সমর্থনভিত্তি পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত। সতেরো বছর যে তারা একসঙ্গে ছিল, সেটাই একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। তার একটা কারণ ছিল এই যে, লালুপ্রসাদ উভয়েরই প্রতিপক্ষ, তাঁকে হারানোর জন্যই এই দুই পক্ষ নিজেদের আদর্শগত বিরোধ সরিয়ে রেখেছিল।

আর একটা প্রচার চলছে যে, নীতীশ এবং লালুর জোট বিহারে 'গুন্ডা রাজ' ফিরিয়ে আনবে। এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, দুর্নীতি এবং অপরাধ আরজেডি'র চরিত্রগত, আর জেডি(ইউ) এবং বিজেপি দল নিশ্চয়ই হিসেবে অনেক পরিচ্ছন্ন, তা না হলে তারা আরজেডি'র তুলনায় ভাল প্রশাসন চালাতে পারত না। ঘটনা হল, জেডি(ইউ) এবং বিজেপি, দু'দলের কোনওটিতেই গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত সদস্যের সংখ্যা কোনও অংশে কম নয়। তাদের জোট সরকারের জমানায় নীতীশের দৃঢ় নেতৃত্বই গুন্ডাগিরিকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। বিজেপির সঙ্গে জোটের ক্ষেত্রে নীতীশ কুমার যদি মাফিয়াদের নিয়ন্ত্রণে রেখে থাকতে পারেন, আরজেডি'র সঙ্গে জোটের ক্ষেত্রেও সেটা পারবেন, এমনটাই ধরে নেওয়া সঙ্গত নয় কি?

প্রশ্ন হল, জেডি(ইউ) এবং আরজেডি'র এই আকস্মিক এবং অস্বাভাবিক জোটকে ভোটদাতারা কী চোখে দেখছেন?

এটা মোটামুটি নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, এই নতুন জোট মুসলমান, যাদব এবং কুর্মি ভোট সংহত করতে পারবে। কিন্তু ইবিসি এবং মহাদলিতদের বিভিন্ন উপগোষ্ঠীর ভোটদাতারা কী করবেন, সেটা বলা কঠিন। আরজেডি জমানায় যাদবরা কিছু কিছু প্রান্তিক গোষ্ঠীর উপর নিপীড়ন চালিয়েছিল, তারা এই জোটকে সমর্থন না-ও করতে পারে। তবে মুসহর গোষ্ঠীর মহাদলিত নেতা জিতনরাম মাঝিকে মুখ্যমন্ত্রী করে নীতীশ মহাদলিতদের সহানুভূতি অর্জন করতে চেয়েছেন, সেটা অনস্বীকার্য। মনে রাখতে হবে, বিহারের জনসংখ্যার প্রায় এগারো শতাংশ মহাদলিত।

সন্দেহ নেই, বিজেপি মাজি সরকারের প্রত্যেকটি ভুলভ্রান্তির সুযোগ নিতে তৎপর থাকবে, বলবে যে লালুপ্রসাদের 'জঙ্গলের শাসন' ফিরে এসেছে। এটাও নিশ্চিত যে, বিজেপি'র যত অন্তর্দ্বন্দ্বই থাক এবং রাজ্যে সুদৃঢ় নেতৃত্বের যতই অভাব থাক, বিহারের উচ্চবর্ণের মানুষ এনডিএ'কে সমর্থন করবেন। ইবিসি-মহাদলিত সমর্থন এনডিএ কতটা পাবে, বলা শক্ত। অবশ্য তারাও ইবিসি-মহাদলিতদের একটা পাল্টা জোট খাড়া করতে পারে।

জাতীয় স্তরে নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে উন্মাদনায় ইতিমধ্যেই ভাটার টান লক্ষ করা যাচ্ছে। এটা কল্পনা করা কঠিন যে, এক বছরের মধ্যে তিনি এমন কিছু করতে পারবেন, যার ফলে বিহারের মানুষ বিপুল ভাবে বিজেপিকে ভোট দেবেন। একটা ব্যাপার এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। বিহারকে বিশেষ বর্গের রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নে বিজেপি আগে বিস্তর হইচই করলেও ক্ষমতায় আসার পরে এ বিষয়ে আশ্চর্য রকমের নীরব হয়ে গেছে। বৃহস্পতিবারের উপনির্বাচনে জেডি(ইউ)-আরজেডি জোট কেমন করবে, সেটা অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ, তবে সামনের বছর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধে এই উপনির্বাচন থেকে যথেষ্ট আঁচ পাওয়া যাবে, এমনটা ধরে নেওয়া ঠিক হবে না। এক বছরে অনেক কিছুই বদলাতে পারে।

এ কথা নিশ্চয়ই বলা চলে না যে, নীতীশ কুমার এবং লালুপ্রসাদের জোটবন্ধন বিহারের পক্ষে এক পরম আশীর্বাদ। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতির বিচারে রাজ্যে বিজেপির উত্থানের মোকাবিলায় আপাতত এ ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প নেই। এবং, এই জোট হয়তো দিব্যি কাজ চালিয়ে দেবে।

বিজেপির সঙ্গে জোটের ক্ষেত্রে নীতীশ কুমার যদি মাফিয়াদের নিয়ন্ত্রণে রেখে থাকতে পারেন, আরজেডি'র সঙ্গে জোটের ক্ষেত্রেও সেটা পারবেন, এমনটাই ধরে নেওয়া সঙ্গত নয় কি?

চিন্ময় কুমার পটনায় ইন্টারন্যাশনাল গ্রোথ সেন্টার-এ অর্থনীতিবিদ

সম্পাদক সমীপেষু

তবে নতুন বই কেন

২০০৫ শিক্ষাবর্ষে প্রাক্ মাধ্যমিক ব্যাকরণের সিলেবাস প্রচলিত প্রাচীন ধারণার পুনরাবৃত্তি এবং বিষয়-বোধে ঘাটতি ভাষা একাধারে বিজ্ঞান, দর্শন এবং কিছু নিয়মের সমবায়। ভাষার অন্তর্গত অপার রহস্যময়তাকে চেনায় ব্যাকরণ। আমরা কী ভাবে ধ্বনির পর ধ্বনি সাজিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করি, তার রহস্য উদ্ঘাটনই ব্যাকরণের কাজ। বাংলা ব্যাকরণ আমরা পেয়েছি সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে। অথচ বাংলা এবং সংস্কৃত দুটি পৃথক ভাষা। কিন্তু আজও কি বাংলা ভাষার পৃথক ব্যাকরণ নির্মিত হয়েছে? উনবিংশ শতাব্দী থেকেই বিকল্প বাংলা ব্যাকরণ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। সেই প্রয়াস আজও অব্যাহত।

নবম শ্রেণির জন্য ব্যাকরণের নতুন সিলেবাসও কোনও দিশা দেখাতে পারেনি। এ যেন পরিবর্তনের জন্যই পরিবর্তন। মূল আলোচনায় আসি। সিলেবাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে 'শব্দ গঠন: উপসর্গ, অনুসর্গ, ধাতু ও প্রত্যয়'। শব্দ গঠনে অনুসর্গের ভূমিকা আমাদের অজ্ঞাত। অনুসর্গ বিষয়টি কারক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত, উপসর্গ, ধাতু ও প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত নয়। শব্দ গঠন অধ্যায়ে অনুসর্গ আলোচিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। বরং নতুন শব্দ গঠনের চমৎকার উপায় সমাস। সিলেবাস কর্তারা শব্দ-গঠন অধ্যায়ে সমাস আলোচনার দরকারও বোধ করেননি। তবে অনুসর্গ কেন? উপসর্গের সঙ্গে ধ্বনিসাযুজ্যের জন্যই কি?

তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয়: 'শব্দ ও পদ, বিশেষ্য-বিশেষণ-সর্বনাম-অব্যয়-ক্রিয়া, বিস্তারিত আলোচনা।' সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রে আমরা পঞ্চপদ প্রাপ্ত হয়ে বাল্যকাল থেকে মুখস্থ করে আসছি। কিন্তু বিশেষ্যের পর কেন বিশেষণ হবে— তা নিয়ে আমরা ভাবি না। এ-ও কি ধ্বনি সাযুজ্য? বিশেষ্যের বিকল্প সর্বনাম। তাই বিশেষ্যের পরই সর্বনাম আলোচিত হওয়া উচিত এবং পরম্পরাগত এই ক্রমিক ধারণার অবসান ঘটিয়ে বিষয়টি শিক্ষার্থীদের মনে রোপণ করা আবশ্যক। সংস্কৃত ভাষায় অব্যয়ের সংজ্ঞা অনুসারে ব্যবহার বাংলা ভাষায় নেই। বাংলা ব্যাকরণে যেগুলোকে আমরা 'অব্যয়' বলি সেগুলি কতখানি অব্যয় তা বিস্তৃত আলোচনাসাপেক্ষ বিষয়। ব্যাকরণ কোনও অচলায়তন জড় বস্তু নয়। সংস্কৃত ভাষাতেও ব্যাকরণ ভাবনা কখনওই অনড়, অপরিবর্তনীয় এবং বাদ-প্রতিবাদহীন ছিল না।

নির্মিতি অংশে বলা হয়েছে— ভাব সম্প্রসারণ, ভাবার্থ, সারাংশ প্রতিটি ক্ষেত্রে অনধিক ১০টি উদাহরণ ১২ পৃষ্ঠার মধ্যে হাতে-কলমে (অনুশীলনী) অংশ-সহ থাকবে। অর্থাৎ ১০×৩=৩০টি উদাহরণ এবং অনুশীলনীর জন্য বরাদ্দ ১২টি পৃষ্ঠা। পৃষ্ঠা বরাদ্দে এত কার্পণ্য কেন? ভাবার্থ এবং সারাংশের ফারাক কতখানি? ভাবসম্প্রসারণ, ভাবার্থ, সারাংশ এবং গল্পলিখনের জন্য বরাদ্দ নম্বর ৫। প্রবন্ধের জন্য শব্দসংখ্যা অনধিক ৩০০, ভাবসম্প্রসারণের জন্য শব্দসংখ্যা অনধিক ১৫০ (সূত্র: নিবেদিতা ভবনে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা)। প্রাক্ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩০০ শব্দ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধকে বাঁধা যায়?

তা হলে নতুন সিলেবাসের নতুন বইয়ে পরিবর্তন কিছুই নেই? পরিবর্তন একটিই, ব্যাকরণ হবে রংচঙে বই। রঙিন ভাবে বিভাবিত হয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ব্যাকরণ বইকে চার রঙে রাঙানোর নির্দেশ দিয়েছে। নির্দেশ পালনে ছোট প্রকাশকদের পরিত্রাহি অবস্থা। এবং সব দেখেশুনে আমাদের মনে হচ্ছে—'মন না-রাঙায়ে কাপড় রাঙালি— কী ভুল করিলি যোগী!'

পূর্ণ দত্ত। *তাঁতিপাড়া, বীরভূম*

বাইক নামক বিপদ

■ আগে ছিল ঘরে ঘরে সাইকেল। এখন সাইকেলের সঙ্গে ঘরে ঘরে মোটরবাইক। এই মোটরবাইকের দাপটে রাস্তা চলা দায়। অল্পবয়সি ছেলেরা এত জোরে বাইক চালায় যে পথ চলা দায়। মাথায় হেলমেট নেই। বাইকের পিছনে বন্ধুবান্ধবদের বসিয়ে মোবাইলে কথা বলতে বলতে প্রচণ্ড জোরে বাইক চালানোর সময় কোনও নিয়মকানুন মানে না। গাড়ি চালাতে চালাতে তারা এত ব্যস্ত যে পথচারীর দিকে, অন্য যানবাহনের দিকে তাদের কোনও নজর থাকে না। যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে নিজের এবং অন্যের জীবনে বিপদ ডেকে আনতে পারে। ট্রাফিক পুলিশের কাছে অনুরোধ, এদের সামলান।

বিনোদবিহারী মণ্ডল। *ধারিন্দা, তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর*